নারী ও শিশু পাচার রোধে সকলেরই সচেতন হওয়া জরুরি

সেলিনা আক্তার

মানব পাচার বর্তমান সময়ে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিষয় দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে মানব পাচার হয়ে আসছে। নারী ও শিশু পাচার বর্বর যুগের নিকৃষ্ট কাজ। আধুনিক যুগেও এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। এটা সত্যিই অমানবিক। নারী ও শিশু পাচার রোধে সবার আগে আমাদের প্রত্যেকেরই সচেতন হওয়া জরুরি। এক্ষেত্রে নারী শিক্ষার প্রসার এবং সচেতনতা বাড়াতে হবে। কারণ যারা পাচারের শিকার হচ্ছে তারা বেশির ভাগই অশিক্ষিত। তাই যে কোনো মূল্যে বন্ধ করতে হবে নারী ও শিশু পাচার।

আমার গ্রামের এক তরুণী নাসিমা আক্তারের কথা না বললেই নয়। তিন বছর আগে ডিভোর্স হয় তার। মাত্র ৩০ হাজার টাকায় মালয়েশিয়া গিয়ে ভালো বেতনে কাজ করে অভাব ঘোচাতে পারবে দালালের এমন প্রলোভনে এক রাতে ১৮৭ জনের সঙ্গে ছোটো একটি ট্রলারে চেপে বসে নাসিমাও। কখনো গুড় ও চিড়া খেয়ে, বেশির ভাগ না খেয়ে থেকে ২১ দিন পর ধরা পড়ে মালয়েশিয়া সীমান্ত পুলিশের হাতে। শুধু নাসিমাই নয় এভাবে প্রতিদিন অসংখ্য নাসিমা, তাহমিনা পাচার হয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ থেকেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নারী ও শিশু পাচার হয়। কোভিড মহামারির মধ্যেও মানবপাচারকারীদের অপতৎপরতা থেমে নেই। কিছুদিন আগে বণিক বার্তায় প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছর বঙ্গোপসাগরের উপকূল দিয়ে এক হাজারের বেশি মানুষ মানব পাচারের শিকার হিসেবে শনাক্ত হয়েছে। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনের (ইউএনএইচসিজার) তথ্যে শুধু জুনেই ৬৬৯ জনের পাচার হওয়ার হিসেব পাওয়া গেছে।

আন্তর্জাতিকভাবে নারী ও শিশু পাচারকে আধুনিক যুগের দাস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পাচার প্রতিরোধে সকলে একমত হলেও পাচার কাকে বলে এ বিষয়ে বড়ো ধরনের বিভ্রান্তি রয়েছে। পাচারের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, পদ্ধতি সবই আগের তুলনায় অনেক জটিল হয়ে গেছে।

সাধারণত যে কোনো ধরনের শোষনের উদ্দেশ্যে জোর খাটিয়ে ছলচাতুরী করে, ভয়ভীতি প্রদর্শন করে এবং চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে লোক সংগ্রহ, স্থানান্তর, আশ্রয়দান ও অর্থের বিনিময়ে গ্রহণ ইত্যাদি যে-কোনো কর্মকাণ্ডকে পাচার বলে গণ্য করা হয়। ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম) এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী মানবপাচার তখনই ঘটে যখন একজন অভিবাসী জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করে অবৈধভাবে চাকুরি প্রাপ্তির আশায়, অপহৃত বা বিক্রিত হয়ে কোনো কাজে নিযুক্ত হন। মেয়েদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব, প্রেম ও বিয়ের ফাঁদ, আয়-রোজগারের সুযোগ ইত্যাদির কারণে নারী ও শিশুরা বেশিরভাগ পাচারকারীদের শিকারে পরিণত হয়। এক শ্রেণির মুনাফালোভী-ব্যবসায়ী চক্র নারী ও শিশুদের চাকরি, বিবাহ, ভালোবাসা বা অন্য কিছুর প্রলোভন দেখিয়ে তাদের বিদেশে পাচার করে চলেছে। বছরের পর বছর এসব পাচারকৃত নারী ও শিশু বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন সহ্য করছে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে।

নারী ও শিশু পাচারের প্রায় অধিকাংশই ঘটে দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে। এসব দেশগুলো থেকে শ্রমিক, ভিক্ষুক বা উটের জকি হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রতি বছর কয়েক লাখ নারী ও শিশু পাচার হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট দেখা যায় মালয়েশিয়ার পাচারের উদ্দেশ্যে সমুদ্রপথে নৌকাযোগে যাদের পাঠানো হয় তাদেও অধিকাংশরই বয়স ১৮ এর নীচে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে বিশ্বের প্রায় ২০ লাখ মানুষ পাচারের শিকার হয়েছে। একটি বেসরকারি সূত্রমতে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর ৩০ হাজার নারী ও শিশু দালালের হাতে পড়ে পাচার হচ্ছে। এদের মধ্যে ছেলে শিশুর সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার এবং মেয়ে শিশু প্রায় ১০ হাজার। বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের হিসেবে প্রতি মাসে বাংলাদেশ থেকে ২শ থেকে ৪শ তরুণী ও শিশু পাচার হচ্ছে ভারত ও পাকিস্তানে। ভারতীয় সমাজকল্যাণ বোর্ডেও সূত্র মতে, ভারতে মোট ৫ লাখ বিদেশি যৌনকর্মী রয়েছে। এর শতকরা একভাগ বাংলাদেশি এবং কলকাতায় এই সংখ্যা শতকরা ২.৭ ভাগ। জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী গত ১০ বছরে বাংলাদেশ থেকে তিন লাখের বেশি নারী-শিশু পাচার হয়েছে ভারতে। তবে বেসরকারি এনজিওর দাবি, পাচারের সংখ্যা ৫ লাখের বেশি। ইউনিসেফ ও সার্কেও এক হিসেব অনযায়ী বাংলাদেশ হতে প্রতি বছর প্রায় সাড়ে ৪ হাজার নারী-শিশু পাচার হয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পর হতে এ পর্যন্ত এদেশ থেকে কমপক্ষে ১০ লাখ নারী ও শিশু পাচার হয়ে গিয়েছে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ পরিবারই দুস্থ, নিঃস্ব ও অসহায়। আর এ পরিস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিকভাবে সংঘবদ্ধ এক শ্রেণির প্রতারক। তারা প্রলোভন দেখিয়ে অসহায় মেয়েদের শহরে চাকুরি বা যৌতুকবিহীন বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে পাচার করে দিচ্ছে অন্ধকার জগতে। পাচারকারীদের প্রলোভনের শিকার হচ্ছে দেশের ছিন্নমূল, ভবঘুরে নারী ও তাদের অভিভাবকবৃন্দ এবং দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে জর্জরিত অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, তালাকপ্রাপ্ত ও বিধাব নারীরা। অসহায় নারীরা সুন্দরভাবে বাঁচার আশায় নতুন জীবনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পাচারকারীদের পাতা জালে আটকা পড়ছে। মাতাপিতারা অর্থ উপার্জনের আশায় বেশি বেতনের চাকরির প্রলোভনে পড়ে বা সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় না জেনে শিশু সন্তানদের তুলে দিচ্ছে পাচারকারীদের হাতে। এভাবে শিশুরার প্রতারণার শিকার হচ্ছে। নারী ও শিশু পাচারের অন্যতম কারণ হলো দারিদ্র্য, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, পিতামাতার অসাবধানতা ও অসতর্কতা, সমাজে মেয়েদের অবমূল্যান ইত্যাদি।

নারী ও শিশুদের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পাচার করা হয়। এদের মধ্যে রয়েছে পতিতাবৃত্তিতে বা পর্নো সিনেমায় ব্যবহার করা, মধ্যপ্রাচ্যে উটের জকি হিসেবে ব্যবহার করা, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত করা, শরীরের রক্ত বিক্রি করা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ব্যবসা করা এবং মাথার খুলি, কঙ্কাল রপ্তানি করা।

এশিয়ার মধ্যে নারী পাচারের ঘটনার দিক থেকে নেপালের পরই বাংলদেশের স্থান। পাচারকারীরা বিভিন্ন পথে নারী ও শিশু পাচার করে থাকে স্থলপথ, জলপথ বা বিমানপথে। বাংলাদেশ থেকে পাচারের যে উদাহরণগুলে পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় বিমানযোগে কিছু পাচার হয়, তবে স্থলপথে সীমান্ত অতিক্রমের মাধ্যমেই বেশি সংখ্যক নারী ও শিশু পাচার হয়। এদেশের সাথে ভারতের ৪ হাজার ২২২ কি. মি. এবং মায়ানমারের সাথে ২৮৮ কি. মি. সীমান্ত রয়েছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর সীমানা দিয়েই পাচার হয় বেশি। বাংলাদেশের পাচারকারীরা ভারতের বিভিন্ন সীমান্ত ব্যবহার করে পাকিস্তান, মধ্যপ্রচ্যসহ বিভিন্ন দেশে নারীদের পাচার করে। পাচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় বাংলাদেশ অঞ্চলের ১১টি রুট।

২০০০ সাল পর্যন্ত পাচার সম্পর্কিত নির্দিষ্ট কোনো আইন ছিল না। বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ সংশোধিত ২০১৩ অনুযায়ী যেসব অপরাধ এ আইনের অন্তর্ভুক্ত তা হলো দহনকারী বা ক্ষয়কারী, নারী পাচার, শিশু পাচার, নারী ও শিশু অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, ধর্ষণ, ধর্ষনজনিত কারণে মৃত্যু, নারীর আত্মহত্যায় প্ররোচনা, যৌন নিপীড়ন, যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটালো, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদিও উদ্দেশ্যে শিশুর অঙ্গহানি, ধর্ষণের ফলে জন্মলাভকারী শিশু সংক্রান্ত বিধান। উল্লিখিত যে কোনো ঘটনার শিকার হলে ভিকটিম নিকটবর্তী থানায় গিয়ে বিষয়টি জানাবেন। থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এজহার হিসেবে গণ্য করলে তিনি ঘটনাটি প্রাথমিক তথ্য বিবরণী ফরমে লিপিবদ্ধ করবেন। পরে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট এখতিয়ারসম্পন্ন হাকিম আদালতে প্রেরণ করবেন। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলায় বাদী নিজস্ব কোনো আইনজীবী নিয়োগের প্রয়োজন নেই। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯২ ধারা অনুযায়ী তিনি সরকারের পক্ষ থেকে আইনজীবী পাবেন।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধিত আইন-২০১৩ অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল ১৮০ দিনের মধ্যে বিচারকাজ শেষ করবেন। এই আইনের বিচার চলাকালে যদি ট্রাইব্যুনাল মনে করেন কোনো নারী বা শিশুকে নিরাপত্তামূলক হেফাজতে রাখা প্রয়োজন, তাহলে ট্রাইব্যুনাল তাকে কারাগারের বাইরেও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে বা যথাযথ অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিতে পারেন।

পাচারকারী বিশেষ কোনো ব্যক্তি নয়, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিক ব্যক্তি এই কাজের সাথে জড়িত থাকে। প্রকৃত অনুযায়ী পাচারকারীচক্রকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। মূলহোতা বা পরিকল্পনাকারী দালাল, সংগ্রহকারী এবং সহযোগী। এছাড়াও রয়েছে পরিবার, পরিবহণ চালক ও মালিক ঘাট মালিক এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কতিপয় সদস্য। সরকার নারী ও শিশু পাচারের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করাসহ পুলিশ সদর দপ্তরে স্থাপন করা হয়েছে মনিটরিং সেল, স্থল ও বিমানবন্দরগুলোতে নেয়া হয়েছে বিশেষ তল্লাশির ব্যবস্থা, সীমন্তবর্তী জেলাসমূহের জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে একটি কমিটিও কাজ করছে। আবার উদ্ধারকৃত নারী ও শিশু পুনর্বাসনের জন্যও হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা ও কর্মসূচি।

বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ সংশোধিত ২০১৩ অনুযায়ী অপরাধি প্রমাণিত হলে অপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে। এ ছাড়া রয়েছে অর্থদণ্ডের বিধানও। কেউ যদি মামলা করতে অসমর্থ হন বা কোনো হুমকির সম্মুখীন হন, তাহলে সরকারি খরচে আইনি সহায়তা প্রদান করা হয়। সেক্ষেত্রে প্রতি জেলায় লিগ্যাল এইড অফিস রয়েছে। তাছাড়া জাতীয় মানবাধিকার সংস্থা, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (মাসক), নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল ইত্যাদি। এছাড়া নির্যাতনের কোনো ঘটনা ঘটলে ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে তাৎক্ষণিক প্রতিকার পাওয়া যায়।

নারী ও শিশু পাচার রোধে গণমাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি বড়ো ধরনের ভূমিকা নিতে পারে। গণমাধ্যমগুলো জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান ও সতর্কবাণী নিয়মিতভাবে প্রচার করতে পারে। ইতিমধ্যে দেশের মিডিয়াগুলো গত কয়েক বছরে এ বিষয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার এবং সংবাদপত্রগুলো নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধে নিয়মিত বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ, ফিচার, অনুসন্ধানী ও ব্যাখ্যমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার লোক, মসজিদের ইমাম, শিক্ষক ছাড়াও পরিবারের সকলে আরো সচেতন হলে এবং এ বিষয়ে আরো বেশি বেশি প্রচারকালে নারী ও শিশু পাচারের মাত্রা হ্রাস পাবে। নাসিমা, তাহমিনার মতো পাচার হওয়া নারীদের পূর্ব থেকেই সচেতন করা গেলে তারা পাচারকারীদের প্রলোভনে পড়ে সর্বশান্ত হতো না।

-০০-

(পিআইডি-শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম ফিচার)